তপন সিংহের ছোটদের ছবি

সৌমেন্দু দাশমুন্সী

ছোটদের জন্য ছবি করার প্রসঙ্গে তপন সিংহ একবার বলেছিলেন, 'বুদ্ধি, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, ছোটদের নিজস্ব জগৎ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে ছোটদের ছবি করা যায় না। এছাড়া ক্যামেরাসহ ছবি তৈরি করার সময় টেকনিক্যাল দিক সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকা দরকার।'

ছোটদের ছবি দিয়েই তাঁর পরিচালক জীবন শুরু করতে চেয়েছিলেন তপন সিংহ। দুর্ভাগ্যবশত সে ছবি করতে না পারায় 'নিতান্তই ব্যক্তিগত দুঃখ' -ও সেসময় তাঁর ছিল। ১৯৫৪-য় প্রথম ছবি 'অঙ্কুশ', '৫৫-উপহার' ৫৬-য় কমেডি ছবি 'টনসিল'-এর পর যে ছবি তাঁকে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও পরিচিতি এনে দিল তা রবীন্দ্রনাথের কাহিনি অবলম্বনে 'কাবুলিওয়ালা'। কাবুলিওয়ালা'-কে ছবি হিসেবে নির্বাচনের কৃতিত্ব অবশ্য প্রযোজক অসিত চৌধুরীর। তপন সিংহ বহুবার তাঁর লেখায়, সাক্ষাৎকারে অকপটে এ কথা জানিয়েছেন। বাবা-মেয়ের সম্পর্কের সুরে বাঁধা এ ছবি দেশ-কালের সীমানা ছাড়িয়ে এ চিরকালীন মর্মস্পর্শী আবেদন রেখে যায়। সেখানে 'টেকনিকালি অত্যন্ত নিচুমানের ছবি' হলেও 'কাবুলিওয়ালা' এদেশের বিদেশের ছোট বড় সবারই মন জয় করতে পেরেছিল।

পরে আবার রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প থেকে 'অতিথি' (১৯৬৫) করার সময়ে ছবির কিশোর নায়ক তারাপদর সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি আর সংগীতও এ ছবির অপরিহার্য চরিত্র হয়ে উঠেছিল। 'ধরা দিয়েছি গো আমি আকাশের পাখি' গাওয়া তারাপদই একদিন আবার ঘরছাড়া হয় মেলায় অংশ নিতে আসা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গানের টানে— বাইরের উন্মুক্ত বড় জগতের টানে। ছবির শেষ দৃশ্যে খোলা আকাশ—, অকূল দরিয়ার মাঝনদী আর বিশাল পালতোলা নৌকার মধ্যে তারাপদর বাঁশির সুর আলোয় আলোয় মুক্তিরই পথ দেখায়। তপন সিংহের নিজের কাছেও 'অতিথি' পছন্দের ছবি ছিল, 'humanist angle' থেকে ওই 'universal freedom', 'মানুষের ফ্রিডম' -এর কথা তিনি জানাতে পেরেছিলেন বলে।

'কাবুলিওয়ালা' বা 'অতিথি' তপন সিংহের ঠিক পুরোপুরি 'ছোটদের ছবি' না হলেও তা ছোট বড় সবার কাছেই সমাদৃত হয়েছিল। অনেক পরে, ১৯৭৭ নাগাদ তপন সিংহের কাছে সর্বপ্রথম প্রস্তাব আসে ছোটদের জন্য ছবি করার। প্রস্তাবটি দিয়েছিলেন তাঁরই আগের একটি ছবি 'হারমোনিয়াম'-এর (১৯৭৬) প্রযোজক শ্রী রাম অবতার জালান। ছোটদের ছবি নির্মাণ নিয়ে বেশির ভাগ প্রযোজকই যখন অনীহা দেখান, সেখানে শ্রী জালানের প্রস্তাব নিঃসন্দেহে তাঁকে উৎসাহিত করেছিল। ছোটদের ছবি করার সমস্যা প্রসঙ্গে তিনি যেসব কারণগুলি বলেছিলেন তার মধ্যে আর্থিক সমস্যা ছিল প্রধান কারণ। সেসব ছবি থেকে বেশির ভাগ সময়েই প্রযোজকের ঘরে টাকা ফেরৎ আসার সম্ভাবনা ছিল না। পরে অবশ্য 'চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি' গঠিত হওয়ার পর ছোটদের ছবির প্রযোজনার ব্যাপারে তিনি আশাবাদী হয়েছিলেন। তবে শুধু আর্থিক নয়, ছবির তৈরি অন্য সমস্যাও আছে। ছোটদের ছবি নির্মাণে পরিশ্রম বেশি। আউডোরের ছোটাছুটির সাথে থাকে ছবিতে কোন শিশুশিল্পী থাকলে তাকে সঠিক ভাবে তৈরি করার দায়িত্বও। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে 'কাবুলিওয়ালা'-র সময়ে টিঙ্কু ঠাকুর বা 'অতিথি' করার সময়ে পার্থ মুখোপাধ্যায় বা অন্যান্য ছবিতে ছবির শিশু অভিনেতা অভিনেত্রীর সঙ্গে তপন সিংহের যে অসমবয়স্ক বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল তা কিন্তু ওঁনারই সযত্নলালিত পরিচর্যায়। 'বাবা-মা অনেক যত্ন করে সাবধানি মন নিয়ে শিসুদের 'বড়' করেন। একটা ছবিতে তাদের দিয়ে কাজ করাবার সময় সে কথাটা প্রতি মুহূর্তে খেয়াল রাখতে হবে। এমন কিছু তাদের দিয়ে 'বলানো' অথবা 'করানো' উচিত নয়, যাতে তাদের চরিত্র বিকাশে বিঘ্ন ঘটে।' ছবি তৈরির দেড়-দু'মাস আগে থাকতেই স্টুডিওতে নিয়ে এসে তিনি তাদের সাথে গল্পগুজব, খেলাধুলো করতেন। আস্তে আস্তে তাদের জড়তা যেত কেটে। তাদের সঙ্গে মিশতে গিয়ে হয়ত এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করলেন যা তাঁর চিত্রনাট্যে আগে থাকতে ছিল না— 'এক্কেবারে নিজস্ব'। তিনদিন ক্যামেরার সামনে আড়ষ্ট থাকলেও চতুর্থ দিন হঠাৎ করে ওই শিশুশিল্পী 'ওপেন' করল— 'ফুল ফোটার মতো'। তবে পরের দিকের শিশুশিল্পীদের সঙ্গে কাজ ক'রে তাঁর মনে হয়েছিল তারা অনেক বেশি সচেতন, তীক্ষ্ণবোধসম্পন্ন। তাদের দিয়ে কাজ করানো অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল। আর এতকিছুর শেষে ছবি মুক্তিলাভের পর, ছোটরাই হলে গিয়ে ছবি না দেখতে পেলে তা কখনোই 'সার্থক শিশু চলচ্চিত্র' হয়ে উঠতে পেরেছে বলে তিনি মনে করেননি।

ছোটদের ছবিকে তিনি দু'ভাগে ভাগ করেছিলেন। একটি চার থেকে আট এবং দ্বিতীয়টি আট থেকে চোদ্দ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য। ছবির মধ্যে দিয়ে শেষপর্যন্ত যাতে আনন্দ পায় সেটাই ছিল তাঁর প্রধান ভাবনা। সে ক্ষেত্রে ছবিকে 'সুপার কোটেড' বা 'ইমোশনাল' করতেও তাঁর আপত্তি ছিল না। ছোটদের ছবির পরিচালক হিসেবে তপন সিংহ সচেতনভাবেই কিন্তু এই ট্রিটমেন্ট ব্যবহার করেন। 'ছোটদের জন্য যখন ছবি করতে বসি তখন মনটাকে অনেকদূর প্রসারিত করে নিই। কারণ জানি ছোটদের মনস্তত্ব বড়ো খোলামেলা।' তাই কাহিনি নির্বাচনের সময়ে সচেতনভাবেই জঙ্গল - আকাশ-সমুদ্রকে ব্যাকড্রপ হিসেবে ব্যবহার করলেও 'টেকনিক সর্বস্ব' ছবি না ক'রে গল্পের মধ্যে তিনি নিয়ে আসেন পুরাণ-ইতিহাস-কিংবদন্তীর সাথে চিরন্তন মানবিক মূল্যবোধকে।

সেকারনেই 'সফেদ হাতী' -তে (১৯৭৮) দেহাতি গাঁয়ের ছেলে শিবু একদিন জঙ্গলে দেখা পায় সাদারঙের হাতি ঐরাবতের (দেবরাজ ইন্দ্রের বাহনেরও নাম) বা 'আজ কা রবিনহুড'-এ (১৯৮৭) তেত্রার স্বপ্নে বারবার ফিরে ফিরে আসে তার মাস্টারজির কাছে শোনা শেরউড বনের কিংবদন্তী নায়ক। গ্রামের দরিদ্র মানুষের বঞ্চনার সূত্রে এ যুগেও প্রস্তুতি শুরু হয় 'আজ কা রবিনহুড' -এর। গোলাপী মুক্তা সৃষ্টির কিংবদন্তী সুমতি বা তাদের দরিদ্র জেলে পরিবারের কতটা সমৃদ্ধি আনল, তার থেকেও কিন্তু ছবির শেষে বড় হয়ে ওঠে পারিবারিক বন্ধন, পারস্পরিক মানবিক সম্পর্কে আর সততার কাহিনিই। স্বাধীনতার তিরিশ বছর পরও এই ভারতবর্ষেরই মধ্যে থাকা অজানা-অচেনা রহস্যে ঢাকা ঐতিহাসিক আন্দামানকে পটভূমিকা ক'রে তপন সিংহর ১৯৭৯-র ছবি 'সবুজ দ্বীপের রাজা'। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সন্তু -কাকাবাবু অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি, দুর্ধর্ষ ডাকাতদলের পিছু ধাওয়া, কাহিনিসূত্রে গল্পের চরিত্রদের সাথে জাহাজে ক'রে আন্দামান পাড়ি জমানোর রোমাঞ্চ—এসব তো ছিলই। কিন্তু তার

সাথেও সমান্তরালে চলছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের এক most wanted বিপ্লবীর কালাপানি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার রহস্য, মহাজাগতিক বস্তুখন্ডের অনন্ত আলোকশক্তি বিকিরণের কথা, যা হাজার হাজার বছর ধরে ওই ভারতীয় আদিম জনজাতির কাছ থেকে পেয়ে এসেছে 'দেবতা'-র সম্মান।

তপন সিংহের ছোটদের ছবিতে মূল চরিত্রের সঙ্গে আমরা প্রায়ই দেখা পাই এমন এক মানবীয় বা অ-মানবীয় চরিত্র - সম্পর্ক যা সবসময়ে আমাদের খুব চেনা হয়ত নয়, তবে অবাস্তবও নয়। 'কাবুলিওয়ালা'-য় মিনির সাথে বন্ধুত্ব হয় সুদূর আফগানিস্তান থেকে আসা এক কাবুলিওয়ালা রহমতের। মিনি 'খোঁকী'-র মধ্যেই রহমত পেত তার মুলুকে ছেড়ে আসা ছোট্ট মেয়ের ছায়া। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে বিশালদেহী, কাঁধে দশমণী ঝোলা ফেলা এক পাঠানের সম্পর্ক, মিনির কাছে বন্ধুত্ব বা রহমতের কাছে বাৎসল্যপ্রেম যাইহোক না কেন, তা কিন্তু সেকাল কেন একালেও সহজ নয়। জমিদারবাড়িতে অত্যন্ত আদর যত্নের সাথে থাকা তারাপদ ওই পারিবারিক বন্ধন কাটিয়ে বৃহত্তর বিশ্বসংসারের ডাকে আবার 'ঘর' ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। বিশ্বপ্রকৃতি আর সংগীতের টানে তাকে বার বার ঘরছাড়া করে। ঘরছাড়া সেই পাগলের মুক্তি দিগন্ত-বিস্তৃত আকাশের উদাত্ত আহ্বানে, আলোয় আলোয়, ধূলায় ধূলায়, গসে ঘাসে। 'সফেদ-হাতী' - তে শিবুর সঙ্গে বন্ধুত হয় 'অ-মানুষ' ঐরাবতের। রাজপাট, হিসেবে - নিকেশ দেখে ক্লান্ত - নিঃসঙ্গ' শিকারি রাজা' বিনোদনের জন্য শিকারে বেড়িয়েও, ছবির শেষে শিবু আর তার 'দোস্ত' - কে কুর্নিশ করেন। নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে সম্মান জানান তাদের ওই বন্ধুত্বের। 'সবুজ দ্বীপের রাজা' নিখোঁজ বিপ্লবী গুণময় তালুকদার দ্বীপের আদিম আদিবাসীদের সঙ্গে এন এক মানবিক সম্পর্কের টানে জড়িয়ে পড়েন যে তাঁর স্বপ্নের স্বাধীনতালাভের তিরিশ বছর পরও সরকারের ডাক তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আজকের স্বাধীন ভারতবর্ষের মধ্যে অবস্থিত হয়েও সেই দ্বীর আর সেই দ্বীপের রাজা, রাজধানী নয়াদিল্লীর রাজনৈতিক পালাবদল, রাজা অদল-বদলের গল্পটুকুও জানাতে পারেননি। 'সভ্য' জগতের চেয়ে তথাকথিত ওই 'ওসভ্য' ভারতবাসীর সাথেই বাকি শেষ জীবনটুকু কাটিয়ে দেবার আনন্দে আবার তিনি ফিরে যান দ্বীপবাসীদের মাঝে। ছবির শেষে তাই 'শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনী'-র সুসংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ, যা এককালে তাঁকেও ঘরছাড়া করেছিল দেশমাতৃকার স্বাধীনতালাভের বড় স্বপ্নের টানে, তা তাঁকে স্মৃতিতাড়িত আবেগপ্রবণ করলেও, সেই 'অসংস্কৃত' আদিম ভারতীয় জনজাতির সেবাকেই তিনি মাতাকে বন্দনা করার মহান ব্রত হিসেবে বেছে নিলেন। আবার 'আনোখা মোতি' - তে সুমতির সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন ঘটে কোন মানুষ বা জীবজন্তুরও নয়, নেহাতই একটি গোলাপী মুক্তার। পুরাণের কাহিনি-কিংবদন্তী মিলিয়ে গোলাপী মুক্তার সৃষ্টির ইতিহাস ছোট্ট নিষ্পাপ সুমতির মনে ফেলে গভীর সম্ভ্রমের ছাপ। সে তার ওই মোতিকে পূজা করে। সাগরবেলা থেকে তার কুড়িয়ে আনা অসংখ্য শামুক- ঝিনুকের খোলস দিয়ে ঘর সাজিয়ে উৎসব পালন করে।

তপন সিংহর ছোটদের ছবির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল হঠাৎ আসা প্রলোভনকে জয় ক'রে সততার পথে, মনের ডাকে সাড়া দিয়ে সামনের দিকে পথ চলার গল্পও।

লক্ষ্য ক'রে দেখুন 'কাবুলিওয়ালা'-য় রহমত জেল থেকে ছাড়া পেয়েই তার 'খোঁকী'-র টানে মিনির বাড়িতে ছুটে আসে। মিনির বাবা-মার কাছ থেকে তার দেশে ফেরার টাকা হাতে পেয়েও প্রথমে সে তা নিতে প্রবলভাবে অস্বীকার করে। রাজ্য আর রাজকন্যার প্রলোভন 'আকাশের পাখি' তারাপদকে সংসারে ধরে রাখতে পারেনি। ঐরাবতের সঙ্গে বন্ধুত্ব শিবুর কাছে সোনার মোহরের চেয়েও বেশি দামি। তেত্রার সারল্য-সততা জনজাগরণের ডাক দেয়। অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঘুরে দাড়ানোর সেই ডাক যা মানুষের অধিকার, তার ন্যায্য পাওনা বিষয়ে সচেতনও করে। 'সবুজ দ্বীপের রাজা'-য় বিপ্লবী ফিরিয়ে দেন 'সুসভ্য সমাজে সসম্মানে ফিরে যাওয়ার ডাক। 'আনোখা মোতি'-তে সুমতি আর তার বাবা তাদের ওই 'হঠাৎ পাওয়া সৌভাগ্য'-কে ফিরিয়ে দিতে চায় আবার সমুদ্রের কাছেই।

'বয়স যতই হোক না কেন আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটি করে শিশু ঘুমিয়ে থাকে। রূপকথা বা রোমাঞ্চের সাড়া পেলেই যে কৌতুহলী হয়ে উঠে বসে।' তাই ছোটদের ছবি (বা ছোট-বড় সবাই মিলে উপভোগ করার ছবি) ছাড়াও তিনি যখন বড়দের জন্যও ছবি করেন, তখনও তপন সিংহ মাঝে মাঝে নিয়ে আসেন রূপকথা বা ফ্যান্টাসির ছোঁয়া। মনে পড়ে, নিত্য বিবদমান এক মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের আন্তরিকতা বা ভালবাসার পরশে ম্যাজিক এনে দেওয়া ধনঞ্জয়ের গল্প (গল্প হলেও সত্যি, ১৯৯৬)? ওই পরিবারকে জোড়া লাগিয়ে এক ভোরবেলা আরো একটা অন্য পরিবারকে নতুন একটা ভোর দেখাতে সে-ও একদিন চলে গিয়েছিল। 'এক যে ছিল দেশ'-এ (১৯৭৭) বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার, ফ্যান্টাসি - কমেডির আড়ালেও কোথায় যেন বিষাদ-সুরে শোনায়—

এক যে ছিল দেশ
যে দেশে সব পেয়ে হায়
সব হারাল
নেইকো দুঃখের শেষ

('এক যে ছিল দেশ' ছবির শীর্ষ-সংগীত)

'বাঞ্ছারামের বাগান' (১৯৮০) বা শেষের দিকে 'আজব গাঁযে আজব কথা'-ও (১৯৯৮) রূপকথার আড়ালে আমাদের চেনা সমাজ জীবনকে একটু অন্যভাবে দেখতে শেখায়। মনে পড়ছে কি, 'নির্জন সৈকতে'-র (১৯৬৩) নায়কের সেই প্রাচীন স্থাপত্যর মধ্যে দাঁড়িয়ে এই সমাজ সংসার ছাড়িয়ে মহাজাগতিক এক উপলব্ধির কথা? বা 'এক ডক্টর কি মত'-এ (১৯৯১) বিজ্ঞানসাধক ডাঃ দীপঙ্কর রায়ের সন্ধ্যোবেলার সেই তারা ভরা আকাশের কথা? বা ডাঃ মিত্রর যে অমৃতভাষণ মৃত্যুপথযাত্রীর শঙ্কাকে উত্তীর্ণ করে অমৃতময় আলোর পথযাত্রায় (হুইলচেয়ার, ১৯৯৪)?

ছোটদের ছবি করতে তিনি বহিরঙ্গে যতই অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে আসুন না কেন, রহমত - মিনি, তারাপদ, শিবু-ঐরাবত, তেত্রা মাস্টারজি, সবুজ দ্বীপের রাজা বা শেষতম ছোটদের ছবিতে সুমতির গল্পেও পরিচালক তপন সিংহ কিন্তু শেষপর্যন্ত আগামী দিনের 'বড়'দের 'খোলামেলা মনস্তত্বে' বিশ্বাস রেখে শোনান উন্নততর জীববোধেরই কথা।